রবীন্দ্র ছোটোগল্পে নারীদের সাহিত্য-সাধনার আখ্যান

ড. অনন্য ভট্টাচার্য
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, হুগলি মহসিন কলেজ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ

ABSTRACT (মূল নিবন্ধের সংক্ষিপ্তসার) : সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে বহুতর বাধার সম্মুখীন হতে হয় সাহিত্যিক ও শিল্পীকে। কখনো সমাজ-প্রতিবেশের সঙ্গে কখনো পরিবার ও আত্মজনের সঙ্গেও তৈরি হয় নানা ধরণের সংঘাত ও বিরোধিতা। ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে রক্ষণশীলতার কারণে নারীদের সাহিত্য সৃষ্টির বিষয়টি কখনই নন্দিত হয়নি বরং এক্ষেত্রে সম্মানহানিকর নানাধরণের বিদ্রূপ, তাচ্ছিল্য জুটেছে নারীদের জীবনে।
তবু নানা প্রতিকূলতা ও বাধা অতিক্রম করে সাহিত্য সাধনার পরিসর তৈরি করেছে নারীরা নিজেদের চেষ্টাতেই। পরবর্তীকালে তারা লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের দুই নারী চরিত্র সাহিত্য সৃষ্টির প্রেষণায় নানা বাধা অগ্রাহ্য করে কিভাবে নিজেদের সাহিত্যপ্রতিভা প্রকাশের জন্য সচেষ্ট হয়েছে ও সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে তাই আলোচিত হয়েছে এই প্রবন্ধটিতে।

KEY NOTE ADDRESS (নিবন্ধের মূল বক্তব্য বিষয়ের সংকেত সূত্র) : ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে নান্দনিক ও সৃজনশীল ক্ষেত্রে প্রথমাবধি গুরুত্ব ও প্রাধান্য পেয়েছে পুরুষেরা। সৃজনশীলতায় নারীরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করলেও তা কখনই যথাযথ মর্যাদা ও স্বীকৃতি পায়নি। সাহিত্যের মতো সৃজনশীল ক্ষেত্রেও নারীরা তাদের সৃজনীশক্তির প্রকাশ ঘটালেও তা উপেক্ষিত থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সাহিত্যসাধনায় নিযুক্ত দুই নারী যেভাবে পুরুষশাসিত সমাজের নানা বাধা উপেক্ষা করে সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছে তার মধ্য দিয়ে সেকালের এবং একালেরও সৃজনশীল ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য নারীর লড়াই ও দ্রোহ, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে সমকালের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে এই নিবন্ধে।

MAIN ARTICLE (মূল নিবন্ধ) : অন্তঃপুরের নিরালায় চিরঅভ্যস্ত সংসার যাপনের মধ্যেও অনিবার্য এক বোধের প্রেরণায় দুই নারীর সাহিত্যচর্চার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ 'খাতা' আর 'দর্পহরণ' গল্পে।
শৈশবকাল থেকেই লেখাপড়া চর্চার বাইরে উমার কাব্য লেখার 'বদ অভ্যাস' তৈরি হয়েছিল। শিশুপাঠ্য নানা রচনা পড়তে গিয়ে তার মনে যখন যে-রকম অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়া তৈরি হতো তাই সে লেখার চেষ্টা করতো ঘরের দেওয়ালে, বইয়ের পাতায় অথবা খাতা-পত্রে। বালিকা উমার শৈশবের এই সাহিত্যচর্চায় তেমন কোনো বাধা ছিল না। কিন্তু দাদা গোবিন্দলালের খাতায় মনের এক বিচিত্র অনুভূতির কথা লিখতে গিয়েই বাধলো বিপত্তি। গোবিন্দলাল নিজেকে একজন চিন্তাশীল লেখক হিসেবেই জানে। সে প্রায়শই বিজ্ঞান ও দর্শনের নানা জটিল তত্ত্বসমৃদ্ধ প্রবন্ধ লেখে কাগজে। এজন্য সে নিজে যথেষ্ট গর্বিত ও অহংকারী ছিল। তার খাতার মধ্যে বোন উমার এই অনধিকার সাহিত্যচর্চা সে ভালোভাবে মেনে নেয়নি। ক্রোধবশত উমার স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্যচর্চার সমস্ত উপকরণগুলি ধ্বংস করে দিল তার দাদা গোবিন্দলাল। এমনকি একারণে মারও খেতে হল উমাকে দাদার হাতে। লেখাপড়া ও কাব্যচর্চা যে মেয়েদের ক্ষেত্রে দোষের বিষয় সেই প্রথম তা জানতে পেরে কেঁদে ফেলল উমা।
'প্রথমে তাহাকে মারিল, অবশেষে তাহার একটি স্বল্পাবশিষ্ট পেন্সিল, আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত একটি ভোঁতা কলম, তাহার বহুযত্নসঞ্চিত যৎসামান্য লেখ্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল। অপমানিতা বালিকা তাহার এতদৃশ গুরুতর লাঞ্ছনার কারণ সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া ঘরের কোণে বসিয়া ব্যথিত হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।'১
পরে অবশ্য অনুতপ্ত গোবিন্দলাল তার বোনকে সেই উপকরণগুলি ফিরিয়ে দিয়েছিল। আর বোনের লেখাপড়া ও কাব্যচর্চার জন্য দিয়েছিল একটি খাতা। এই খাতাটিই এরপর থেকে বালিকা উমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে উঠল। এবার সে নিজের মতো স্বাধীনভাবে সাহিত্যচর্চা করতে শুরু করল।
উমার লেখার বিষয় ও ভাবনাগত স্বাতন্ত্র্য এবং ক্রমশ তার পরিণত লেখক হয়ে ওঠার প্রয়াসকে এভাবেই আভাসিত করেন রবীন্দ্রনাথ। তবে উমার এই নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যচর্চায় ছেদ পড়ল তার বিবাহে। বাপের বাড়িতে মেয়ের লেখাপড়া বাড়ির লোকেরা একরকম মেনে নিলেও শ্বশুরবাড়িতে যে সেই স্বাধীনতা থাকবে না সে বিষয়ে সতর্ক করে দিলেন উমার মা-'বাছা, শাশুড়ির কথা মানিয়া চলিস, ঘরকন্নার কাজ করিস, লেখাপড়া লইয়া থাকিস নে।' অনভিজ্ঞ হলেও উমা এটা বুঝতে পারল শ্বশুরবাড়িতে প্রাত্যহিক ঘরকন্নার কাজ ছাড়া অন্য কাজ বিশেষত সাহিত্যচর্চা একেবারেই নিষিদ্ধ। তবু শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার সময় সে সঙ্গে নিয়ে গেল তার খাতাটি। আসলে এই খাতাটি যে তার খেয়ালি ভাবনার অকপট প্রকাশ আর তার মনের বিচিত্র অনুভূতি প্রকাশের একমাত্র অবলম্বন। তাই শ্বশুরবাড়ি গিয়েও দুপুরের নিভৃত অবসরে আপন খেয়ালে লেখালেখির কাজে মগ্ন থাকতো সে।
দরজা বন্ধ করে বালিকা গৃহবধূর এই সাহিত্যচর্চার কথা একসময় প্রকাশ্যে এল। বহাবাহুল্য, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ঘরের বউয়ের লেখাপড়ার বাতিক ভালোভাবে নিতে পারেন নি। উমার স্বামী প্যারীমোহন নিজেকে একজন বড় মাপের প্রতিষ্ঠিত লেখক ভেবে যারপরনাই আহ্লাদিত ছিলেন। কিন্তু নিজগৃহের অন্তঃপুরে একজন সরস্বতীর আবির্ভাব তাকে বিচলিত করে তুলল। স্ত্রীর সাহিত্যচর্চা যে সংসারের কাজের বিঘ্ন ঘটাবে এবং সার্বিকভাবে অকল্যাণসূচিত হবে এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। শুধু তাই নয়, লেখাপড়া জানা বিদূষী-মহিলাদের বিবাহ করলে দাম্পত্য জীবনে যে অশান্তি ও চরম সংকট তৈরি হতে পারে এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। ফলে উমার সাহিত্যচর্চা প্যারীমোহনকে নানাভাবে অস্থির করে তুললো।

প্যারীমোহনের মতে, বিদ্যাচর্চা ও সৃজনশীল নান্দনিক ক্ষেত্রে একমাত্র পুরুষের অধিকার ও আধিপত্য সমাজ-স্বীকৃত। কাজেই পুরুষ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা, সাহিত্য ও মননচর্চার জগতে নারীর অনুপ্রবেশ সামাজিক ও সাংসারিক অকল্যাণের কারণ হতে বাধ্য। প্যারীমোহনের এই তত্ত্বের সঙ্গে হয়তো সহমত ছিলেন বাংলাদেশের তৎকালীন তথাকথিত প্রগতিশীল শিক্ষিত মেধাজীবীরা। আর এই কারণেই বাংলাদেশের উমাদের সাহিত্যচর্চার সমর্থনে উদারচেতা শিক্ষিত মানুষকে তেমনভাবে দেখা যায়নি। তাই নারীদের সাহিত্য প্রতিভা ও সৃজনশীলতা যদি সাংসারিক ও সামাজিক বিরুদ্ধতায় অপচয়িত ও অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যায় আর লেখক হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত গঞ্জনা ও বিদ্রূপ সইতে হয় তবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো তেমন কাউকে পাওয়া যায় না। সংসারের প্রাত্যহিকতায় অভ্যস্ত জীবনে একটুকরো মুক্তির আকাশ খোঁজার জন্য নারীদের সাহিত্যচর্চা যে বাস্তবে কতখানি অসম্ভব এই গল্পটি তারই নিদর্শন। উমার সাহিত্যচর্চার একমাত্র অবলম্বন তার খাতাটি শেষপর্যন্ত কেড়ে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলেছিল প্যারীমোহন। অন্তঃপুরের এক নারীর সাহিত্যচর্চার মতো গর্হিত ও দুঃসাহসিক কাজের চিহ্নটুকুও রাখেনি সে।

স্ত্রীর সাহিত্যচর্চা ও সাহিত্যপ্রতিভা কিভাবে দাম্পত্য সম্পর্কে নিগূঢ় মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা তৈরি করে তার একটি দৃষ্টান্ত 'দর্পহরণ' গল্পটি। এই গল্পটি একইসঙ্গে নির্ঝরিণী নামের একটি নারীর লেখক হয়ে ওঠার যাবতীয় সম্ভাবনার অপমৃত্যুর কাহিনিও বটে। উমার মতো নির্ঝরিণীকে অবশ্য শ্বশুরবাড়ির কটূক্তি বা গঞ্জনা সইতে হয়নি সাহিত্য লেখার জন্য। বরং এক্ষেত্রে সে বরাবর শ্বশুরের সস্নেহ প্রশ্রয় ও সহযোগিতাই পেয়েছে। পুত্রবধূ নির্ঝরিণীর সাহিত্যপ্রতিভা লালনের ক্ষেত্রে তার শ্বশুরমশাই রীতিমতো যত্নবান ছিলেন। কাজেই সাহিত্যচর্চার জন্য প্রাথমিকভাবে তেমন কোনো প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়নি নির্ঝরিণীকে।

নির্ঝরিণীর সাহিত্যবোধ, বিশেষত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ও অনুশীলনের পরিচয় পেয়েছিল তার স্বামী হরিশচন্দ্র দত্ত। এক্ষেত্রে স্ত্রীর চিঠি পাওয়ার পরে হরিশচন্দ্রের উপলব্ধিটি স্মরণীয় :

'এটুকু বেশ বোঝা গেল, নববধূ বাংলাভাষাটি বেশ জানেন। তাঁহার চিঠিতে বানান ভুল ছিল কিনা তাহার উপযুক্ত বিচারক আমি নই, কিন্তু সাহিত্যবোধ ও ভাষাবোধ না থাকিলে এমন চিঠি লেখা যায় না, সেটুকু আ ◌াজে বুঝিতে পারি।'২

বিদূষী লেখক স্ত্রীর সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ থাকলেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু ঈর্ষার কাঁটা বিদ্ধ করত হরিশচন্দ্রকে। সংসার-সমাজ-কর্মস্থল সর্বত্র স্ত্রীরত্নের ভূয়সী প্রশংসা শুনে শুনে একধরণের হীনমন্যতা ও সংকোচবোধ তৈরি হয়েছিল তার। সমাজের সর্বত্র সাহিত্যিক স্ত্রীর পরিচয়ে পরিচিতি ও খ্যাতি অর্জন মেনে নিতে পারেনি সে। একজন পুরুষ সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করবে স্ত্রীর পরিচয়ে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না হরিশচন্দ্র। ফলে তার মনের মধ্যে শুরু হল জ্বালাময় প্রদাহ। হরিশচন্দ্র এরপর মরিয়া হয়ে নানাভাবে উচ্চাঙ্গের বিদেশি সাহিত্যের সঙ্গে প্রতিতুলনার মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করল এতকাল যাবৎ তার স্ত্রী নির্ঝরিণী যা লিখেছে তা সবই নিতান্ত সাধারণ মানের ও অকিঞ্চিৎকর। তাছাড়া বিদ্যেবুদ্ধি, মেধা ও মননশীলতায় সে যে নির্ঝরিণীর চেয়ে পুরোদস্তুর উঁচুদরের লোক তাও বোঝাতে সক্ষম হল সে স্ত্রীকে। হরিশচন্দ্রের এখন একটিই উদ্দেশ্য সাহিত্যিক স্ত্রীর যাবতীয় সৃজনশীল রচনাগুলিকে নিতান্তই নিকৃষ্ট বলে প্রতিপন্ন করা। কারণ স্ত্রীর প্রতিভার দীপ্তি ম্লান না হলে সংসারে ও সমাজে স্বামীর বিদ্যেবুদ্ধি ও মেধার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে যায়।

তাই স্ত্রীর প্রতিভা সম্পর্কে প্রাথমিক মুগ্ধতা অচিরেই দূর হয়ে গেল হরিশচন্দ্রের। এখন তার একমাত্র কাজ হল বিদূষী স্ত্রীর দর্পহরণ। ইংরেজি সাহিত্যের প্রথিতযশা লেখক কবিদের সাহিত্যের প্রসঙ্গ এনে স্ত্রী নির্ঝরিণীর লেখাগুলি যে কতখানি নিম্নমানের প্রভৃত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে তা বোঝাতে সচেষ্ট ও সমর্থ হল সে।

হরিশচন্দ্র নানা যুক্তি ও তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা নিয়ে স্ত্রীকে বোঝাল যে, মেধা মনন ও বুদ্ধিবৃত্তিতে স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরুষ অনেক এগিয়ে। সুতরাং যাবতীয় নান্দনিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়াই উচিত। সেদিক থেকে সাহিত্যমূলক সৃজনক্ষেত্রে নারীদের অনুপ্রবেশ নিতান্তই নিন্দনীয় এবং আপত্তিজনক। তাছাড়া সাহিত্য রচনার মতো যথার্থ দক্ষতা ও প্রতিভা মেয়েদের নেই বলেই তার দৃঢ় ধারণা। এ বিষয়ে নির্ঝরিণীকে সে স্পষ্টভাবে বলে : 'লিখিবার যোগ্য কোনো লেখা দেশে কোনোদিন কোনো স্ত্রীলোক লেখে নাই।'৩

এতদিনে সমাজ ও সংসার অভিজ্ঞ নির্ঝরিণী উপলব্ধি করতে পেরেছে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সাহিত্য জগতে নারীর সাহিত্য প্রচেষ্টা কতখানি অবমাননাকর। সৃজনশীল কাজে সংলগ্ন হলে প্রশংসার পরিবর্তে মেয়েদের জোটে কটূক্তি, তাচ্ছিল্য ও বিদ্রূপ। এই কটূক্তি ও অপমান সইতে না পেরে উমা কান্নাকাটি করেছে। লেখার খাতা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য স্বামীর কাছে কাকুতি মিনতি করেছে। নির্ঝরিণী কিন্তু এক্ষেত্রে তীব্র ক্ষোভে ঝলসে উঠে বলেছে : 'কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না! মেয়েরা কি এতই হীন!'৪

শেষ পর্যন্ত স্বামীর সঙ্গে গল্প লেখার প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েও নির্ঝরিণী পুড়িয়ে দেয় তার বড় যত্নের লেখার খাতাটি। উমার লেখার খাতা কেড়ে নিয়েছিল তার স্বামী। বহু অনুনয়েও সেই খাতা ফেরত পায়নি সে। নির্ঝরিণী নিজেই পুড়িয়ে ফেলে তার লেখার খাতা। এ যেন এক ধরণের আত্মাহুতি। এই খাতাটির সঙ্গেই চিরকালের মতো পুড়ে খাক হয়ে গেল তার মেধা, মনন ও সৃজনপ্রতিভা। আর কোনদিনই গল্প লিখবে না সে। সাহিত্য রচনার কারণে দাম্পত্য সম্পর্কের অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় রোধ করার জন্যই তার এই কঠোর আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। পরে তার স্বামী হরিশচন্দ্র অনুতপ্ত হয়ে নির্ঝরিণীর মেধা ও প্রতিভাকে স্বীকৃতি দিলেও আর গল্প না লেখার সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছে সে শেষ পর্যন্ত।

আসলে নির্ঝরিণী ততদিনে বুঝেছে একথা : পুরুষের অনুগ্রহ, সম্মতি ও উদারতার ওপরেই নির্ভরশীল নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত সাহিত্যচর্চা। পুরুষ সমালোচকদের দৃষ্টিকোণ ও বিশ্লেষণের ওপরেই নির্ভর করে একজন নারীর লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা, স্বীকৃতি ও খ্যাতি অর্জনের বিষয়টি। তাই তার লেখা সম্পর্কে নানাধরণের বি◌ূপপূর্ণ সমালোচনা করতো যে স্বামী তিনিই যখন নির্ঝরিণীর সাহিত্যকে উচ্চাঙ্গের রচনা বলে ভূয়সী প্রশংসা করেন তখন আর তাতে আল্পুত হয় না সে। বরং এ প্রসঙ্গে নির্ঝরিণীর সংশয়ী, অভিমানাহত ও যন্ত্রণাবিদ্ধ উচ্চারণ আমাদের আড়ষ্ট চেতনাকে রীতিমতো স্পন্দিত করে তোলে :

'আমি কি জানি না যে, আমার লেখা ছাই লেখা! স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া লোকে মিথ্যা করিয়া প্রশংসা করে।'৫

REFERENCE (তথ্যসূত্র) :

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'খাতা', গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড), বিশ্বভারতী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ২১৬
২. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'দর্পহরণ', গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড), বিশ্বভারতী সংস্করণ, ৪র্থ খণ্ড, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ. ৪৯৮
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১
৪. প্রাগুক্ত
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২

REFERENCE BOOK (সহায়ক গ্রন্থ) :

১. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড), ৪র্থ খণ্ড, আশ্বিন ১৩৬৯, বিশ্বভারতী সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation